ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের ভিত্তি

নীলাঞ্জন সরকার

৩১ জানুয়ারী, ২০২২

২০২২-এর জানুয়ারী মাসে কুনওয়ার রণজিৎ প্রতাপ সিং (আরপিএন সিং), কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে প্রাক্তন লোকসভার সদস্য বা এমপি, দলত্যাগ করে কংগ্রেসের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন। কিন্তু সিং দলের কোন সাধারণ সদস্য মাত্র ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের হয়ে বহুবার বিধায়ক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এক সময় তিনি যুব কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন। এছাড়াও, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে মনে করা হয়। সারা বিশ্বেই, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের নতুন কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বা কনসলিডেটেড গণতন্ত্রগুলিতে একটি মুখ্য রাজনৈতিক দলের এই রকম একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের দলত্যাগের ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে বিরল।

তবে, এই ধরনের দলত্যাগের ঘটনা ভারতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ১৯৬৭ সালে গয়া লালের ঘন ঘন দলবদলের দিকে ইঙ্গিত করে, একে "আয়া রাম গয়া রাম" রাজনীতি বলেই ডাকা হয়। গত পাঁচ বছরে, চারশ সতের জন বিধায়ক বা মন্ত্রী (ভারতের বিধানসভার ৪,৬৬৪টি আসনের নয় শতাংশ) একটি দল ছেড়ে আরেকটি দলে যোগ দিয়েছেন এবং আবার নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মত উন্নয়নশীল দেশগুলির গণতন্ত্রেও এই রকম দলত্যাগ আর 'এক দলের সদস্য হিসাবে নির্বাচনে জিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য দলে যোগ দেওয়া" বা "ফ্লোর ক্রসিং"-এর উচ্চ হার দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলির বিধায়ক ও সদস্যদের মধ্যেএই বিশ্বস্ততার অনুপস্থিতিকেই আমি ভারতের *দলের প্রতি দুর্বল আনুগত্য* হিসাবে বর্ণনা করি।

এই মুহূর্তে, যখন পণ্ডিতদের মনোযোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের উপর তখন আমি দেখাতে চাই যে, এই রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ আসলে ভারতের রাজনীতির অন্তর্নিহিত অসুখ অর্থাৎ দলের প্রতি আনুগত্যের অভাবেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বিশেষত, একটি রাজনৈতিক দলের নেতার রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার কেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভোটদাতাদের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হলে তা নির্বাচনে কোন সদস্যের দলত্যাগের নেতিবাচক প্রভাবকে কমিয়ে দেয়। আদতে, ভারতের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিতেই এই চরম কেন্দ্রীকরণ প্রথম শুরু করে এবং মোদী নিজেই ভারতের গুজরাট রাজ্যের একজন সফল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সে দিক থেকে দেখলে, এই মুহূর্তে যা হচ্ছে তা হল জাতীয় রাজনীতির "আঞ্চলিকীকরণ" – অর্থাৎ, জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক রীতি প্রয়োগের সূচনা হচ্ছে।

কেন্দ্রীকরণের রাজনীতি

১৯৯০-এর দশক নাগাদ, যখন কংগ্রেসের সুবৃহৎ পার্টি যন্ত্র ভেঙে পড়তে থাকে, তখনই বেশ কিছু আঞ্চলিক দল নির্বাচনী সাফল্য পেতে শুরু করে। দ্রুত একটি হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে যে, রাজ্যস্তরে বিধায়কদের এফেক্টিভ নাম্বার অফ পার্টিজ (ইএনপি) – প্রতিটি রাজনৈতিক দলের যতগুলি আসন আছে তার বর্গানুপাতের মোট ব্যস্তানুপাতিক হার – ১৯৮৬ সালে ছিল মোটামুটি চারজন যা ১৯৯৬ সালে বেড়ে আটের বেশি হয়ে গেছে। সব চেয়ে সফল নতুন

দলগুলির ছিল জনতা দল (সেক্যুলার), জনতা দল (ইউনাইটেড), জাতীয় কংগ্রেস দল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং তৃণমূল কংগ্রেস। লক্ষণীয়ভাবে, এই আঞ্চলিক দলের মধ্যে অনেকগুলিই মূলত ছিল "পারিবারিক ব্যবসা" যেখানে দলের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতেই পরিচালনার রাশ থেকে যায়। কংগ্রেস পার্টির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যখন আরো বেশি গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি বাতাবরণ গড়ে তোলা যেত, তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করব?

যদি বিধানসভার একজন সম্ভাব্য সদস্যই তাঁর দলের প্রতি বিশ্বস্ত না হতে পারেন, তাহলে বিশেষ করে কম ব্র্যান্ড ভ্যালুর নতুন রাজনৈতিক দলগুলি থেকে প্রার্থীদের দলত্যাগ করার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে যায়। এর ফলে, নতুন দলগুলি যদি জনতার ভোটের একটি অংশ ধরে রাখতে চায়, তাহলে একজন প্রার্থীর জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকে। এই রকম সময়ে, একটি নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষে সব চেয়ে ভালো রণকৌশল হল দলনেতার "রাজনৈতিক আবেদনকে তাঁদের বার্তার কেন্দ্রে নিয়ে আসা যাতে ভোটদাতা ও ওই নেতার মধ্যে একটি সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়। এর ফলে, একটি দলের রাজনৈতিক আকর্ষণ ও নির্বাচনী ফলের উপর ওই দলের একজন একক প্রার্থীর খুব সামান্যই প্রভাব থাকে। একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতাকে প্রায় ইশ্বরের পর্যায়ে তুলে দেওয়ার জন্য, দলীয় সংগঠনের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের সম্পদকে ব্যবহার করে এই কাজটি করা হয়।

রাজ্যস্তরের নির্বাচনে যখন এই ঘটনাটি ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন বিজেপি আর মোদীর হাত ধরে, জাতীয় স্তরেও একই জিনিস ঘটতে দেখা যাচ্ছে। অন্য জায়গায় আমি যেমন বলেছি, এই ধরনের রাজনীতির মূল তাৎপর্য হল, নির্ধারিত নীতির পরিণতি ও প্রতিশ্রুত পরিষেবার সঠিক সরবরাহের বদলে, একটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে তার দলপতির সততার উপর। তাই, যে ধরনের রাজনৈতিক আদর্শে দেশের নাগরিকরা তাঁদের সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অর্থনীতিকেন্দ্রিক কাজের গুণমানের জন্য দায়ী করতে পারেন সেই আদর্শের একদম বিপরীতে আমাদের দেখা এই রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের অবস্থান।

প্রযুক্তিতে পরিবর্তন, জনকল্যাণ নীতি এবং রাজনৈতিক আবেদনের কেন্দ্রীকরণ

নির্দিষ্ট নাগরিকদের হাতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছতে সক্ষম করে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতার আবেদনকে কেন্দ্রীভূত করতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছে। বিশেষ করে, স্থানীয় নেতাদের বদলে, দলের রাজনৈতিক নেতার পরিচয়কে ঘিরে জনকল্যাণমূলক সহায়তাদানের কাঠামোটি নির্মাণ করার ফলে তাঁর রাজনৈতিক আকর্ষণকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা আরও সহজ হয়েছে।

ভারতের প্রেক্ষিতে দুটি মুখ্য নীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ঘটনাটি সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, ভারতের সাধারণ সনাক্তকরণ কার্যক্রম বা ইউনিভার্সাল আইডেন্টিফিকেশান প্রোগ্রাম (আধার) এবং জনসাধারণকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকের লেনদেন শৃঙ্খলের মধ্যে সমন্বিত করার জন্য জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তার। এর ফলে এমন একটি প্রণালী তৈরি হয়েছে যাতে সরকার দক্ষতার সঙ্গে নানা সরকারী পরিকল্পনার আর্থিক সুবিধাগুলিকে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পৌঁছে দিতে পারে। এইভাবে, স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী, যাঁরা এই আর্থিক সহায়তার জন্য কোন কৃতিত্ব দাবি না করতে পারেন তাঁদের সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া যায়। এই সরাসরি আর্থিক সহায়তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টিকেই অরবিন্দ সুব্রমানিয়ান "আবশ্যক ব্যক্তিগত পণ্য ও পরিষেবার সরকারী বন্দোবস্ত" বলে আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, ব্র্যান্ডিং-এর ক্ষেত্রে এক ঝাঁক উদ্ভাবনকে

সতর্কভাবে নির্দিষ্ট দর্শকদের কাছে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা, মিডিয়াকে কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার এবং দলের সাংগঠনিক দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে দিয়ে দলনেতা আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজের কৃতিত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি করে নিতে পারছেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, একটি সক্রিয় প্রণালী যার মাধ্যমে নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাঁদের অধিকার নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারীরা রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেন তার পাশাপাশিই এই কেন্দ্রীকরণ ঘটছে। এই স্পষ্ট অসঙ্গতির অর্থ করতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতকে ব্যাপকভাবে "দুর্বলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত রাজনৈতিক দল তন্ত্র" বলে দেখা হয়। এই তন্ত্রে ভোটদাতা ও দলের সম্পর্কের প্রকৃতি দৃঢ়ভাবে মতাদর্শভিত্তিক নয়, বরং আর্থিক সুবিধা পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় রাজনীতিতে কোন রকম আদর্শগত দিকই দেখা যায় না, কিন্তু দলগত প্রতিযোগিতা ও প্রার্থী নির্বাচনের নির্ধারক হিসাবে আদর্শগত ভেদাভেদকে নাও বিবেচনা করা হতে পারে। তবে, ভারতে বাজেট এবং জনকল্যাণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ রাজনৈতিক দল ও সরকারী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয়ভাবে ধার্য করা হয়। এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি কোন খাতে কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হবে সেই বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং তার কৃতিত্বের দাবির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে যার ফলে একজন নেতার রাজনৈতিক আবেদন আরও বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে।

উপরন্তু, এখনও দলের টিকিট দলের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একেবারেই কেন্দ্রীয়ভাবে বন্টন করা হয় (মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলিতে প্রাইমারীর ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ দলের সদস্যরা ভোট দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাঁদের প্রতিনিধি মনোনীত করেন না)। এই কারণেই, দলের নেতৃত্বের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের উপর প্রার্থীদের পুনঃমনোয়ন নির্ভর করে। এর মানে, আঞ্চলিকভাবে প্রার্থীর অবদান যাই হোক না কেন, স্থানীয় ক্ষমতার দিক থেকে প্রতিরোধ আটকাতে, কেন্দ্রীভূত দলগুলি যাদের "আন্তঃদলীয় গণতন্ত্র নামমাত্র" তারা একই প্রার্থীকে আবার মনোনয়ন নাও করতে পারে। বস্তুত, ২০১৪ সালে ভারতে যে জাতীয় নির্বাচনে মোদী ক্ষমতায় আসেন সেই সময় একজন সাংসদের আবার নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য মনোনয়ন পাওয়ার সুযোগ ছিল মাত্র তিপান্ন শতাংশ। এমনকি আবার মনোনয়ন পেলেও একজন ভারপ্রাপ্ত সদস্যের আবার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ যখন সামগ্রিক দায়িত্বপ্রাপ্তের হারই সাতাশ শতাংশ। এই নকশাটি রাজ্যস্তরেও সত্য। ১৯৭৭ সাল থেকেই ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশের প্রতিটি নির্বাচনে প্রথমবার নির্বাচিত বিধায়কের অনুপাত অন্তত ষাট শতাংশ এবং সাম্প্রতিকতম রাজ্য নির্বাচনগুলিতে জয়ী বিধায়কদের মধ্যে আটাত্তর শতাংশই প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় নেতারা যাতে কেন্দ্রের দলনেতার জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে না পারেন, এই প্রণালী সেটাই নিশ্চিত করে।

এর মানে এই নয় যে, ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদ, বিজেপির দলীয় সংগঠন এবং নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবনের বিশেষ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। তবে ভারতের রাজ্যস্তরে বহুদিন ধরেই সফলভাবে ঘটে চলা রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবনের নীতিই যে কেন্দ্রের অবস্থানকে প্রভাবিত করেছে তা বোঝা প্রয়োজন। আমি আশা করছি যে, রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণ যে শুধুই একজন মাত্র নেতা বা একটি নির্দিষ্ট দল নয়, বরং একটি বৃহত্তর পরিকাঠামোগত বিষয়, তা তুলে ধরতে পারব।

নীলাঞ্জন সরকার নতুন দিল্লীর সেন্টার অফ পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফেলো। তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সিএএসআই ফল ২০২১ ভিজিটিং ফেলো ও পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো ছিলেন।